Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৭১তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪৩২ / 24.02.2026

-: সম্পাদক:-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৭১ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মহাভারতের উপাখ্যান	ভস্মলোচন
যোগবাণী	শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ
লা জবাব লন্ডন	শ্রী অরূপকুমার ভট্টাচার্য
একটাই মন্ত্র	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

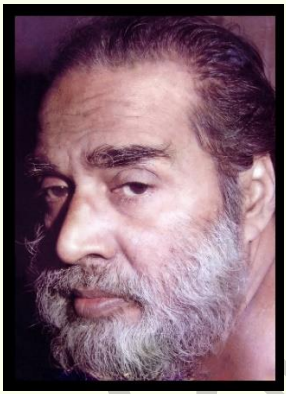

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"সংযমের দ্বারা এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে যদি আমরা সমস্ত কর্ম করি নিশ্চয়ই সেকাজে সিদ্ধি আসবে, আর সে কাজও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠবে।"

শ্রাবণ মাস পড়ে গেল। সারা মাসে লেখার সময় পাই না। বইও আজকাল বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় না। সম্পাদক মশাই কোর্টে গিয়ে নিয়ম মেনে প্রকাশনার তারিখ পরিবর্তন করিয়ে এনেছেন প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহের জন্য। পার্থসারথির কাজ এখন তিনজনে করি। প্রেসের দায় সম্পাদক মশাই সামলান। বাকী কাজ আমি আর সোমা করি।

সবচেয়ে মজা হয় পত্রিকার নতুন বছর শুরু হলে। গ্রাহকদের টাকা যে কি ধীর গতিতে জমা পড়ে তা আর বলবার নয়! চাইবার সময় নিজেকে এতো দীন মনে হয়! মনে হয় যেন অন্যায় করে ফেললাম। অথচ শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে কেমন টপাটপ বার্ষিক চাঁদা জমা পড়ে যেত। তখন তো দু' একজন পত্রিকার অনেকটা খরচই বোধহয় চালিয়ে দিতেন। আমার অনুমান। এ' বিষয়ে শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে আমার কখনও কিছু আলোচনা হয় নি। এখন তাঁরা আমার উপর এত অকরুণ কেনো জানি না। গ্রাহকদের টাকা না চাইতে এসে যায় গীতাদি, মনু, অপুর কাছ থেকে। তবে ইদানিং গ্রাহকের সংখ্যা তারা বাড়াতে পারছেন না। বাড়ছে আমার আর বাপীর হাত দিয়ে। বার্ষিক চাঁদা পঁচিশ টাকা। সেটা দিতেও কত কষ্ট ! বাপীর এক বন্ধু আছে। শুধু সে নিজে গ্রাহক নয়, তার শ্বশুরমশাইকেও বই পাঠানো হয়। প্রতিবার ১০ই মার্চ এ' বাড়ীতে আসে। কিন্তু পার্থসারথির জন্য টাকা দিতে তার খুব পেট ব্যথা। প্রায় দেড় বছর তাকে ও তার শ্বশুরমশাইকে বই পাঠাচ্ছি – টাকা দেবার মত সময়টুকুও সে করে উঠতে পারেনি। তাঁর মায়ের প্রতি আমার খুব দুর্বলতা থাকবার জন্য বইটা এখনও পাঠাচ্ছি। শুধু মনে হয় একটি মাত্র লোকের অনুপস্থিতিতে এমন ভুগতে হয়? ..... আমার কর্মফল ছাড়া আর কি বলব? তবু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী আমি নই।

আমি উল্টোরথে জগন্নাথ দর্শন করেছি। এবার বাচেন্দ্রীও রথের রশি স্পর্শ

করতে পেরেছে। আজ গিয়ে কাল ফিরে আসবার মতো করে যাওয়া, তাই শুধু নিয়ম রক্ষাই হল। স্বামী বিবিদিষানন্দজীর কৃপায় আমাদের তো থাকবার কোনও অসুবিধা হয় না। সোমার চেষ্টায় আসা যাওয়ার টিকিটটাও কি অদ্ভুতভাবে পেয়ে গেছি! মোটকথা অনেকে বলেন ঠাকুর কৃপা না করলে দর্শন হয় না – এবার কিন্তু শ্রীজগন্নাথ সত্যি কৃপা করেছেন।

পার্থসারথি পত্রিকার জন্য প্রতি বছর শতখানেক টাকা বরাদ্দ রাখেন গোবিন্দদা, কেয়া, মিঠু, সুমিতা, মিসেস আদিত্য, সুচরিতা, মিনতিদি ইত্যাদি কয়েকজন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর খবর অনেকদিন পাইনা। চিঠি পত্র আজকাল ঠিকমতো বিলি হয় না। তিনি তাঁর শত কাজের মধ্যেও লেখা পাঠাতে ভোলেন না। এঁরা আছেন বলেই, সাহায্য করছেন বলেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে পারছে। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মঞ্জুদি কটক থেকে মাঝেমধ্যে লেখা দিতেন। তিনি এখন বেশ মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে আছেন। মানুষ শেষ পর্যন্ত সব শোক কাটিয়ে ওঠে – কাটাতে হয়। মঞ্জুদিও আমার মতো করে সব বিপদ কাটিয়ে উঠবেন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। তাঁকে জানিয়ে রাখি, প্রতি মাসেই পত্রিকা তাঁর কাছে পৌঁছবে কারণ তাঁর মতো গ্রাহিকা আমাদের গর্ব।

এবার গুরু পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে বেশ ভীড় গেল। রাত দশটার পর ক্লান্ত ভাবে বললাম বাপীকে,-"তোর বাবাকে কি এত লোক ভালবাসতেন?" বাপী বললো, "আরও অনেক বেশী লোক ভালোবাসে, তোমার ভয়ে আসেনি।" মনে হল ভয় করা একটু ভালো। জানি না তারা কারা, তবে সবাই মিলে এলে সারারাত গুরুর জন্য জেগে থাকতে হোত। আমার আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যাওয়া হয়নি। স্বামী

বিবিদিষানন্দজী কলকাতা ছেড়ে গেছেন, আর দেখা করতে যাওয়া হয়নি। জানি না আবার কবে যোগাযোগ হবে।

শ্রীমতী বাচেন্দ্রী আজকাল খুব popular হয়ে গেছেন। পুরীতে গিয়ে তিনি রীতিমত সকলের সাথে চোখাচোখি হলে হাসতে শিখেছিলেন, এখানেও বারান্দা থেকে নীচে কাউকে যেতে দেখলে বেশ শব্দ করে ডাকতে শিখেছেন। তার আজকাল এক নূতন উপসর্গ হয়েছে। রাত দুটো থেকে জেগে বসে থাকেন। ফলে আমাকেও জেগে থাকতে হয়। আর কলেজ যাবার সময় তিনটি বাসেই ঘুমিয়ে পড়ছি। এখন প্রায় বছর খানেক এই দুষ্টুমীগুলি চলবে। কথা বলতে শিখলে মনে হয় ওকে একটু বুঝে উঠতে পারব। তখন হয়ত এই অত্যাচারগুলিও কমে যাবে।

আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। পায়ের হাড় বেড়েছে। বড় অর্থোপেডিক সার্জন বলেছিলেন পরে যেদিন যাব হাইড্রোকার্টিজন ইনজেকশন নেবার জন্য যেন তৈরী হয়ে যাই। "আমি দশদিন আর ওমুখো হইনি। ১৯৭৫/৭৬ সালে আমার একবার হাতের হাড় বেড়েছিল। ঐ Injection নেবার দরকার ছিল। কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে কিছুতেই ঐ Injection নিতে দেননি।

এবার সেই কথা মনে রেখে আমিও আর Injection নেবার Risk-টা নিলাম না। কাজেই Specialist মুখো আর না হয়ে যন্ত্রণা সহ্য করছি। পারছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যেন পা নাড়তে পারছি না। কিন্তু তবু চলতে হয়। কাজতো করতে হবে। বার্দ্ধক্য এসে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করবার দিন।

দিন কেটে যাচ্ছে। পুত্তর এখন মোটামুটি ভালো আছে। দীর্ঘকাল আমার সাথে ঝগড়া করছে না। আমি একদিন জিজ্ঞেস করে ফেললাম, “তুই তো আর ঝগড়া করছিস না। বাবা নিশ্চয়ই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন?” জবাব পাইনি। ধরে নিয়েছি কোন একটা কুগ্রহ বিদেয় হয়েছে। মাঝে

মাঝে গ্রহের হেরফের হয়ে যায় তো। সব সুখ সবার সয় না।

আমাদের অনেক বিষয়ে শ্রীপ্রীতিকুমার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কোথাও যাবার আগে আমি ব্যক্ত করি না। আমি দেখেছি আমার আর সেখানে যাওয়া হয় না। তিন তিনবার চেষ্টা করেও আমি তারাপীঠে যেতে পারছি না।

অনেকে আছেন ১৯৮৬ সাল থেকে এ বাড়ীতে আসবার ইচ্ছে ত্যাগ করে ফেলেছেন। তাঁরা নিজেদের বাড়িতেই শ্রীপ্রীতিকুমারকে সেবা করেন। আমি সব চাইব অথচ যাঁকে ভালবাসি, মানি, তাঁর ঘরটা ঘুরে যাব না, এ মতবাদে আমার বিশ্বাস নেই। তাহলে আমিই বা কেন বেলুড় মঠে যাই! ঠাকুরের ঘরটা একবার দেখবার জন্য দক্ষিণেশ্বর যাই কেন? স্বামী প্রণবানন্দজীর স্মৃতি বিজড়িত আশ্রমে ছুটে যাই কেন? আসলে স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটি কথা আছে। এখন দেখি কিশোর কোনও treatment-এর বদল হলে একবার শ্রীপ্রীতিকুমারের ঘরে প্রণাম করে যায়। এখন তাঁর কোনও ত্রুটি দেখি না। কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার সশরীরে থাকবার সময়েও কিশোরের পাত্তা পাওয়া যেতো না। সেই দিনগুলি কি আর ফিরে আসবে? লক্ষ্ণৌতে বসে শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন- "ভগবানের কাছে ভিক্ষা করবে কেন? ভগবানকে খাটাবে, তোমার কথায় ভগবান উঠবেন বসবেন।" ১৯৮৬ সালে সে কথা শুনে আমার কেমন গা শির শির করে উঠেছিল। কত জোর থাকলে একথা বলা যায়। এ একমাত্র শ্রীপ্রীতিকুমারের পক্ষে সম্ভব। ১৯৮৬ সালে ২৪শে নভেম্বর যখন বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, আমি ঐ কষ্ট দেখে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, "হ্যাঁগো, মাকে একবার ডাকলে হয়-ব্যথা কমে যাবে।" দুটি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "কি বলছ? নিজের ব্যথার জন্য মাকে ডাকব?" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর কিছু বলিনি। তার কিছু সময়ের মধ্যে সব শেষ।

ভগবান আলাদা করে কি রূপ, আমি জানি না। তবে এখন শ্রীপ্রীতিকুমারকে

খুব সহজে বলতে পারি, "এটা না হলে ভালো হবে না বলছি। গিয়ে যেন দেখি সব ঠিক আছে।"-কখনও কখনও বলি- "এটা না হলে কাল থেকে খেতে দেব না।" উনি অনেকবার বলেছেন নিজের জন্য চাইতে পারেন না। তাই আমাদের কোনও সমস্যার সমাধান এককথায় সহজে হয়নি।

কি লিখলাম জানি না। গত মাসে Press-এ সমস্ত 'প' গুলি 'স' হয়ে গেছিল। পার্থসারথির পাঠকরা এই Press-এর Composition-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত তাই আমার বিশ্বাস তাঁরাও বাক্য বুঝে সঠিক অর্থ করে নেবেন।
এবারের মতো এখানেই ইতি.....

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – আগস্ট, ১৯৯৩)

মহাভারতের উপাখ্যান **ভস্মলোচন**

কৃষ্ণসখী দ্রৌপদী

(১)

পাণ্ডব গৃহিণী দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ আদর করে 'সখী' বলে ডাকতেন। এই কৃষ্ণসখীত্বের গৌরব অর্জন করতে গিয়ে দ্রৌপদীকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করতে গিয়ে মনে এসে যায় যীশুখৃষ্টের একটি কথাও।

গ্যালিলী ছেড়ে শেষবারের মতো জেরুসালেম যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে 'ঈশ্বরপুত্র' বলে সম্বোধন করতে শুনে জনৈক শিষ্য বা শিষ্যাকে বলেছিলেন যীশু - ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার অর্থটা যে কি, তা যদি তুমি জানতে ! বলা-বাহুল্য, এটি ছিল তাঁর শেষ যাত্রা। এর ক'দিন পরেই তাঁকে প্রাণ দিতে রয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে। সখী দ্রৌপদীকেও ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছিল আঘাতের পর আঘাতে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য,

আমাদের শাস্ত্রপুরাণে যে পঞ্চকন্যার স্মরণে মহাপাতক নাশ হয় ব'লে বলা হয়েছে তাঁদের কথাটাও। দ্রৌপদী ছিলেন সেই সব চরম ও পরম দুঃখভাগিনীদেরই একজন। এরপর একটু ভেবে দেখা যাক্ ব্রজগোপীদের কথাটা। এঁদের প্রসঙ্গে বলতে শোনা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে – 'দুস্ত্যজ্য আর্যপথ নিজপরিজন। সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের সেবন'। এই দুস্ত্যজ্য আর্যপথ (অর্থাৎ যে পথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন - হয়তো বা নীতি বিরুদ্ধও) বলতে কি বোঝায় ? বোঝায় – প্রাচীন ভারতের সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আর্যশাস্ত্র অনুমোদিত একনিষ্ঠ স্বামীভক্তির পথ, ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণভক্তির পথ যে পথে নিজ পরিজন অর্থাৎ স্বামী পুত্র ও সকল আত্মীয় স্বজনকেও ত্যাগ করে, ব্রতী হয়েছিলেন ব্রজগোপীরা কৃষ্ণসেবায়। বলতে বাধা নেই, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ গোপীদের এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করে উঠতে পারেনি। একহাত সংসারে দিয়ে একহাতে ঈশ্বর সেবা করা, যাতে কিনা দু'কুলই বজায় থাকে, এটাই ছিল সে যুগের নীতি। তা না করে, একেবারে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরা - তাঁকে নিয়ে সর্বক্ষণ পড়ে থাকা, সহ্যই বা হয় কি করে সমাজের পক্ষে? মনে হয়, এই-ই ছিল মূল কারণ যে জন্য প্রাচীন মহলে রটেছিল গোপীদের সম্বন্ধে নানাগুজব - শুনতে হয়েছিল তাঁদের অনেক অপ্রিয় কথাও। তা হোক। এতে করে বরং তাঁদের একমুখী কৃষ্ণপ্রেম আরও জোরদারই হয়ে উঠেছিল। অসাধ্য সাধন হ'লেও, সংসারের সকল মায়ামমতা ত্যাগ করে, নিন্দাস্তুতিতে কান না দিয়ে, সমস্ত মনপ্রাণ কৃষ্ণ তথা ঈশ্বরে সমর্পণ করার পক্ষে একদিক দিয়ে এতে তাঁদের অনেকটা সহায়তাই হয়েছিল। তাছাড়া, পেয়েছিলেন তাঁরা এ'পথে মনের মতো সঙ্গী-সাথীও। অন্যপক্ষে সখী দ্রৌপদীর অবস্থাটা কি ছিল? তাঁকেও একদিন স্বেচ্ছায়, হয়তো-বা অনিচ্ছায়ই, দুস্ত্যজ্য আর্যপথ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে এসে পড়তে হয়েছিল তাঁকে তপ্ত কড়াই থেকে একেবারে জ্বলন্ত আগুনে ! গোপীদের মতো সংসার ধর্ম ত্যাগ করে এসে ঈশ্বরভজনে সারা মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া দূরে থাক, সীতা-সাবিত্রীর মতোও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী একপতিলাভের বদলে, বরণ করে নিতে হয়েছিল তাঁকে

একইসঙ্গে পাঁচ-পাঁচজন পুরুষকে স্বামীত্বের পদে। একেবারেই একটা অভিনব ব্যাপার ! তারপর, চলতে হবে তাঁকে সমানভাবে পাঁচজনেরই মন রেখে। নিক্তির কাঁটা - একটু এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষে নেই ! তার প্রমাণ, লক্ষ্যভেদ করে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যে অর্জুনই তাঁকে লাভ করেছিলেন, পাঁচজন স্বামীর মধ্যে তাঁর প্রতি একটুখানি পক্ষপাতিত্বের অপরাধে, মহাযাত্রার বন্ধুর পথে সকলের আগেই তাঁকে মরতে হয়েছিল পথে পড়ে !

(২)

কিন্তু, থাক্ এখন সে সব শেষের কথা। স্বয়ম্বরে দ্রৌপদীকে লাভ করে কুটিরে ফিরে এসে মনের আনন্দে জানালেন পঞ্চপাণ্ডব মাকে তাঁদের সেদিন একটা অদ্ভুত জিনিষ লাভের কথা। জিনিষটি যে কি তা তখনও দেখেন নি কুন্তী, ভাবলেন হয়তো বা আজকের ভিক্ষের কোন একটা বিশেষ ভাল খাবার জিনিষ কিছু পাওয়া গেছে। তাই বললেন তিনি তাঁদের সেটিকে সকলে মিলে ভাগ করে খেতে। কিন্তু একী! এযে একটি পরম-রূপবতী কন্যা ! মুশকিলের ব্যাপার ! যাহোক অনেক জল্পনা-কল্পনার পরে, স্বয়ং ব্যাসদেবের ব্যবস্থাপনায় একটি মেয়েকেই মায়ের কথা মতো পাঁচজনে মিলে বিয়ে করে নেওয়াটাই স্থির করে ফেলা হল! এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, কোন সভ্যসমাজেই যার নজির মেলে না ! তাই কেউ কেউ মনে করেন, এটা ছিল আসলে আগেকার কোন একটা বিলুপ্ত সামাজিক রীতিরই অনুবৃত্তি মাত্র। সে যাই হোক, ঘটনাটি যে পাণ্ডবদের মাতৃভক্তির একটা মোক্ষম নিদর্শন, সে বিষয়ে শত্রুপক্ষেরও বোধহয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে তা সত্ত্বেও প্রশ্ন জাগে – ভাষা বড় না ভাবই বড় ? ভাবকে বাদ দিয়ে ভাষার উপরেই যতকিছু গুরুত্ব চাপালে তাতে করে ভাবের ঘরে চুরি হওয়ার ভয় থাকে না তো, - যেমনটি হয়েছিল এই মহাভারতেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' ও এমনি আরও দু-একটি ব্যাপারেও। তাছাড়াও অন্যদিকে এ' দ্বারা আর একজনের উপরে আজন্মের মতো যে গুরুভার চাপানো হল, তাঁর কি? একটি স্বামীর মন যোগাতেই সতী-সাবিত্রীকে হিমসিম খেতে হয়েছিল, আর এবারে পাঁচটির মন-যোগান।

(৩)

এসে যাওয়া যাক এবারে দ্যূত-ক্রীড়ামত্ত কুরুপাণ্ডবদের সভায়। একদিকে খেলছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং, অন্যদিকে কৌরবদের হ'য়ে মাতুল শকুনি। উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে আছে বাকী চার ভাই পাণ্ডবেরা ও শতভাই কৌরবগণ ছাড়াও, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পরম ধার্মিক বিদূর, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহাবীর কর্ণ ও আরও অনেক রাজা মহারাজারাও। শকুনির অপকৌশলে একের-পর-এক হার হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের। অবশেষে, দাসদাসী, এমন কি নিজেকে ও ভাইদেরও পণ রেখে হেরে যাওয়ার পরে, প্রায় একরকম জ্ঞানবুদ্ধি-হারা হ'য়েই পণ রেখে বসলেন যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাই-এর এক বৌ রজস্বলা দ্রৌপদীকেই! [জ্ঞানবুদ্ধি-হারা না ব'লে উপায় কি? তাঁর এহেন কাজের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা যুধিষ্ঠির নিজে বা অন্য কেউ কখনও দিতে পেরেছেন ব'লে জানা নেই!] আগের মতো, এবারেও হার হ'ল যুধিষ্ঠিরের। ফলে, হয়ে পড়লেন দ্রৌপদী এখন থেকে কৌরবদের আজ্ঞাধীন দাসী। দুর্যোধনের হুকুমে এরপর টেনে-হিঁচড়ে এনে হাজির করা হল দাসীকে কৌরব সভায়! তারপর? তারপর ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বিদুর ও আর-আর সমবেত সকলের সামনে ঘটল যে-কাণ্ডটি, কোন ধার্মিক সমাজের কথা দূরে থাক, সাধারণ ভদ্র সমাজেও তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবেনা! টেনে টুনে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার পরে শুরু করল এবারে দুঃশাসন তাঁর কাপড়খানি ধ'রে টানাটানি! একে একে সকলের কাছেই সকরুণ মিনতি জানাতে লাগলেন দ্রৌপদী। কিন্তু কোনটাতেই কোন ফল হচ্ছেনা দেখে, অবশেষে আকুল হ'য়ে প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হলেন তিনি কৃষ্ণ তথা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লজ্জা নিবারণের আশায়। কাজ হ'ল দ্রৌপদীর প্রার্থনায়। কথা আছে, যতই দুঃশাসন তাঁকে বিবস্ত্রা করতে সচেষ্ট হচ্ছিল, ততই নতুন নতুন রং-বেরং এর বস্ত্রে তাঁর দেহখানি আবৃত হ'য়ে পড়ছিল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল সে নিরস্ত হ'তে। জানি নে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই রূপক কিনা - যেমন দেখা যায় পুরাণের অনেক কাহিনীর বেলাতেই। তবে যাই হোক না কেন, এতে ক'রে কিন্তু অনেকেরই আসলরূপ ধরা পড়ে গিয়েছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরম আনুগত্য ও অসীম

ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় পাওয়া গেলেও কিন্তু ব্যাপারটিতে ভীমার্জুন প্রভৃতির আচরণকে কোন মতেই প্রশংসার যোগ্য ব'লে মনে করা চলে না। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের সম্বন্ধে ভীমের যে প্রতিজ্ঞা, তাও তো কেবল প্রতিশোধমূলক, প্রতিরোধমূলক নয়! অন্যপক্ষেও, দৃষ্টি শক্তি হারিয়েই অন্ধ হোন, আর পুত্রস্নেহেই অন্ধ হ'য়ে থাকুন, বৃদ্ধ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথাটা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু 'মহামানী' রাজা দুর্যোধনের পক্ষেও কোন-একজন অসহায়া কুলনারীর প্রতি এরূপ জঘন্য ব্যবহার কি তাঁর আত্মমর্যাদা বা কুলমর্যাদার হানিকর হয়নি? এরপর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ। কথা আছে বটে - বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আশ্চর্য লাগে - যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য আজীবন ব্রহ্মচারী এমন যে জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্ম, ও যিনি পাণ্ডব-কৌরব উভয়েরই অস্ত্র শিক্ষার গুরু এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র এমন যে দ্রোণাচার্য, তাঁদেরও মন এর ফলে এতটাই 'মলিন' হ'য়ে পড়েছিল যে, অন্নদাতা দুর্যোধনের মুখ চেয়ে এমন একটা ঘৃণিত ব্যাপারেও একটু বাধা দেওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের ছিল না! আর, যে কর্ণ নাকি অর্জুনের চেয়েও বেশী শক্তিশালী - বেশী ধীরস্থির ছিলেন, দানবীর ব'লে যার এত খ্যাতি, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে তাঁর যে অপমান তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অথবা নিছক দুর্যোধনের প্রতি প্রীতির জন্যই, এ অবস্থায় দ্রৌপদীকে 'বেশ্যা' ব'লে সম্বোধন কি তাঁর পক্ষে চরম হীনতারই কাজ হয়েছিল না? [তাই দেখে শুনে মনে হয় - মহাত্মা মনুর যে-উপদেশ – 'স্ত্রী রত্ন দুষ্কুলাদপি'- তা পালন করতে গিয়ে কারও পক্ষেই যক্ষরক্ষ, দানব মানব, নাগকুল, বৈশ্যকুল, শূদ্রকুল - কোন কুলই বাদ না পড়লেও, তাঁর অন্য যে একটি উক্তি – 'যত্র নার্যস্তু পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' - তাকে উপযুক্ত মান দেওয়ার মতো লোক কিন্তু সব যুগেই সুদুর্লভ!]

এতসব সত্ত্বেও কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে এখানে একথাটা বলতেই হয় যে তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন অকপট, নির্ভীক; সত্য বলে যা বুঝতেন, যথাসাধ্য তা পালন করতে চেষ্টিত হতেন। সর্বোপরি, ধার্মিক বলে নিজেকে জাহির করার কোন মতলব তাঁর ছিল না। বরং সারাজীবন ধরে কৃতকর্মের জন্য তাঁকে

অনুশোচনাই করে যেতে দেখা যায়। জানিনা, এই জন্যই তাঁকে ‘ধর্মরাজ’ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল কিনা ! আর সে যুগে একমাত্র তিনিই যে সশরীরে স্বর্গলাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তারও কারণ এই কিনা!

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দ্রৌপদীর নীচের উক্তিটিও-

হে ভগবান! লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের একবর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শতবর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহারা পুণ্যকর্মদ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

অন্য আর কোন আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, এমন কি নিজের মুক্তিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে এভাবে কথাগুলো বলা একমাত্র দ্রৌপদীর পক্ষেই সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। অবশ্য বলাবাহল্য, এরপর ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় পাণ্ডবদের ন্যায় দ্রৌপদীর কৌরবদের দাসীত্ব থেকে মুক্তিলাভ ঘটেছিল।

(৪)

এরপর বাকী কাহিনীটুকু। কৌরব সভায় চরম লাঞ্ছিতা হ'য়ে, হাড়ে-হাড়েই বুঝে নিয়েছিলেন দ্রৌপদী তাঁর অসহায় অবস্থাটা। বুঝে নিয়েছিলেন-ধন- জন-মানই মানুষের চরম ও পরম আশ্রয় নয়! আর কৃষ্ণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধেও ধারণা করবার অবকাশ পেয়েছিলেন তিনি - তাঁকে অন্তর্যামী-লজ্জানিবারক-বিপদবান্ধবরূপে। কিন্তু তাঁর তুষ্টিতেই যে জগতের তুষ্টি, তাঁকে পেলেই যে সব পাওয়া হয়, এ জ্ঞান - এ অনুভূতি বোধ হয় তখনও তাঁর লাভ হয় নি। আর তাই বুঝি এরপর একদিন কাম্যকবনে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে ঋষি দুর্বাসার অসময়ে এসে উপস্থিত হওয়ার ঘটনাটি! এছাড়াও, এই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর তাম্রস্থালী থেকে কণামাত্র শাকান্নগ্রহণে কৃষ্ণের যে পরম তৃপ্তিলাভ, তাছাড়াও, মনে হয়, শাস্ত্রকার এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য ভক্তিই আসল জিনিষ, পূজা-উপকরণ কেবল উপকরণ

মাত্রই! তবে এততেও কিন্তু শেষ হ'তে দেখা যায় না সখী দ্রৌপদীর শিক্ষা বা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার। এরপরও একদিন এই বনবাসকালেই যুধিষ্ঠিরাদির অনুপস্থিতিতে হরণ করেছিল তাঁকে জয়দ্রথ, ও তারও পরে অজ্ঞাতবাসে রাজপ্রাসাদে সহ্য করতে হয়েছিল তাকে কীচকের হাতে লাঞ্ছিতের অপমান। সর্বশেষে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষপর্বে এসে ব্রাহ্মণাধম গুপ্তঘাতক অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত পাঁচ শিশুপুত্রের জন্যও তাঁর মাতৃহৃদয়কে হ'তে হয়েছিল শোকসন্তপ্ত। এছাড়া, মহাপ্রস্থানের পথে সকলের আগে তাঁর দেহপাতের কথাটারও প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই হচ্ছে মোটামুটি কৃষ্ণসখা দ্রৌপদী-ঠাকরুণের কাহিনীটি। আর্তভক্তের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরদিনই এটি কীর্তিত হ'তে থাকবে ভক্ত সমাজে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাটাও ব'লে রাখতে হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকভক্তির প্রকাশ - ঈশ্বরের জন্য সুখ দুঃখ, মান-অপমান, দেহসুখ, এমন কি দেহ চিন্তা পর্যন্তও ত্যাগ করতে পারে, এমন আধার যদি খুঁজতে হয়, তাহলে কিন্তু কেবল হস্তিনাপুর - ইন্দ্রপ্রস্থই নয়, মথুরাপুরী - দ্বারকাপুরী ছেড়েও, যেতে হবে ব্রজপুরীতে-ব্রজবাসীদের কাছে।

"পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেক রকম ধর্মকর্ম করে থাকে, কিন্তু বিপদ, দুঃখ দারিদ্র্য ও মৃত্যু আসলে তারা সব ভুলে যায়। পাখী সমস্ত দিন "রাধাকৃষ্ণ" বলে, কিন্তু বেড়াল ধরলে কৃষ্ণনাম ভুলে ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে।"

-- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

পুনরুত্থানের গুপ্ত অর্থ

অধুনা এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও সহস্র সহস্র জ্ঞানী খ্রীষ্টান ভক্তদের অসহায়ভাবে বিশ্বাস করতে দেখা যায় যে মৃত্যুর পর আত্মা কবরস্থ শীতল দেহের সঙ্গে পুনরুত্থানের সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যে দিন গ্যাব্রিল তার দুন্দুভির নিনাদে জাগরণ ঘোষণা করবে।

গ্যাব্রিল কখন দুন্দুভি বাজাবে?

এটাই যদি পরিকল্পনা হয়, তা' হ'লে পাপী এবং পুণ্যবানদের সমভাবে কেন গ্যাব্রিল শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করাচ্ছেন? তা' হ'লে কি ঈশ্বরের রাজ্যে কার্যকারণের কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা বা বিচার নেই? তা' হ'লে কি "যেমন কর্ম তেমন ফল"- বৃথা? মৃত্যুর পর জীবাত্মা যে সংস্কারের সূক্ষ্ম-কারণ-ছাপ নিয়ে যায়, যা' দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয় তার কি কোন ধারাবাহিকতা নেই? তা' হ'লে কি ছন্দহীন, মাধুর্যহীন, বিচারহীন, স্বৈরতন্ত্রী ঈশ্বর মৃত্যুর পর ভূতগ্রাসকে আবর্জনার স্তূপের ন্যায় ভূগর্ভে নির্দয়ভাবে পৃথ্বী-চাপা দিয়ে রাখেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের নিদ্রায় বা দুঃস্বপ্নে অভিভূত করে রাখেন যতদিন না তাঁর স্বেচ্ছাচারী মন গ্যাব্রিল নামধারীকে হঠাৎ হুকুমজারী করেন দুন্দুভি বাজাও এবং শবদের জাগাও? মনে কর কতিপয় জীবাত্মাদের ভবিষ্যতে কোন এক সময় উত্থানের কথা, ঈশ্বর কি করে নির্বাচন করবেন বিভিন্ন শ্রেণীর শবদের মধ্য থেকে অল্প-বেশী পাপীদের, বিভিন্ন মাত্রার পুণ্যবাণদের, পাপী বা পুণ্যবাণ নয় এমন শিশুদের, কারা চিরদিনের জন্য স্বর্গে যাবেন কিংবা চিরদিনের জন্য নরকভোগ করবেন?

কেন নিষ্পাপ বা অসৎ-শিশুদের দীর্ঘ সময় কবরে অপেক্ষা করতেই হবে?

অসম্পূর্ণ জীবাত্মাদের স্বর্গে বা নরকে পাঠান যেতে পারে না। এতৎ ব্যতীত,

ধীমান শিশুগণ যারা জন্মেই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েছে, তারা ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করে ভাল বা মন্দ কোন কিছু করবার সুযোগই পায় নি। এমন বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রনের অসম্পূর্ণতা, অর্দ্ধ-সম্পূর্ণতা, এবং নিরপেক্ষ জীবাত্মাদের মধ্য থেকে কোন দিব্য-বিচারকই সুষ্ঠু এবং সঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচনই করতে পারেন না। ঈশ্বর যদি সঙ্গতিপূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ, ভাল, মন্দ জীবাত্মা সৃষ্টি করেন, এবং শিশুদের যদি বিচার সম্পন্ন করে পাঠান এবং তারপর হঠাৎ বৈচিত্র্যের জন্যই যদি শিশুদের মৃত্যুর কোলে টেনে নেন তা' হ'লে এই জগৎ একটি বিরাট প্রহসন বা বিশৃঙ্খলাক্ষেত্র বই কিছু নয়, এবং কারোরই সৎ হওয়ার প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি যে, আমাদের স্বাধীন চিন্তার এবং বিবেকের প্রয়োগ-প্রকাশ সময়-সাপেক্ষ, সুতরাং জীবন প্রারম্ভেই যদি শিশু প্রয়াত হয়, তা' হ'লে বুঝতে হ'বে তার কুঁড়িতেই মৃত্যুর কারণ পূর্ব-সংস্কারের স্বল্পায়ুর চেতনা যে স্বল্পায়ু তার পূর্বজন্মে অসংযত, অস্বাস্থ্যপ্রদ জীবন যাপনের কর্মাশয়বশতঃ স্থিরীকৃত হয়েছিল।

কার্য-কারণের নিয়ম ইহলোকে মৃত্যুতে এবং পরলোকে সমস্ত ভূতগ্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করে-

স্বভাবতঃ, কার্য্য-কারণের ফলস্বরূপ যা' সমুদয় মানুষের জীবন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশু তার অকাল মৃত্যুকে ডেকে এনেছে - এ তার পূর্ব-কর্মফল। তাই, সংস্কার বশতই শিশু দ্বিতীয়বার মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনরায় তাকে পৃথিবীতে আসতে হবে তার কর্মফলকে ভোগ করতে এবং তার অমরত্বের চেতনাকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার পূর্বে, স্বল্পায়ুর চেতনাকে লুপ্ত করতে হবে এবং মরণশীলতার ভ্রান্তিকে অপসারণ করতে হবে। পুনরুত্থান সম্পর্কে জনবহুল ব্যাখ্যা কত অসঙ্গত তা' ভেবে দেখ। গ্যাব্রিলের কথাই ধর, যদি গ্যাব্রিল আগামীকালই দুন্দুভি বাজায়, কতকগুলো জীবাত্মা যা' আজ দেহ ছেড়েছে, তারা কালই জেগে উঠবে, সেই সঙ্গে জেগে উঠবে সেই সব জীবাত্মা যারা হয়ত খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী

ধরে মৃত হয়ে অপেক্ষা করছে। আত্ম-মুখীন উন্নত জীবাত্মাদের কয়েক শতাব্দী ঘোর মৃত্যু-নিদ্রায় অবশ করে রেখে বা যুগ যুগ ধরে কবরের ঘোর অন্ধকারে বলপূর্বক কণ্ঠরোধ করে রেখে, অথবা শত সহস্র বর্ষ তাদের শুভ্র-চেতনাকে মোহিত করে রেখে হঠাৎ যদি তাদের জাগায় এবং তাদের স্বর্গ এবং নরকের জন্য নির্বাচন করে – তা' হ'লে এই ধারণা মারাত্মক ভ্রমাত্মক।

ঈশ্বর, স্বাধীন চিন্তা দাতা, জীবাত্মাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ভূ-সমাধিতে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সম্মোহিত করে রাখতে পারেন না।

জীবন্ত জীবাত্মাদের শীতল গহ্বরে জমাট বাঁধিয়ে রেখে অকস্মাৎ উষ্ণ-জাগরণের দ্বারা স্বর্গে বা নরকে প্রেরণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়। গোপনীয়তাই প্রকৃতির স্বভাব; প্রকৃতি যথাযোগ্য মূল্যদানে, রহস্যময়ভাবে ক্রিয়া করেন। বরঞ্চ ঈশ্বর-চৈতন্য জীবাত্মাদের দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্বে এবং অজ্ঞাত ভাবে পাপাশ্রয়ের পূর্বে গ্যাব্রিলকে আদেশ করবেন দুন্দুভির নিনাদ ঘোষণা করতে।

স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ রাজ্যে পুনরায় দেহধারণই পুনরুত্থান।

"Resurrection" শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় - Re-পুনরায় এবং surrecto- ওঠা; অর্থাৎ পুনরায় উঠা বা পুনরায় দেহ ধারণ। জীবাত্মা, দেহ পরিত্যাগের পর, সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দিব্য-জগতের ব্রহ্মাণুর স্পন্দন অনুভব করে। এই পারমাণবিক স্পন্দন, স্থূল -জগৎ থেকে দিব্য-জগতে অবস্থান্তরের সময় শ্রুত হয় এবং ইহাই গ্যাব্রিলের দুন্দুভির নিনাদ।

মৃত্যুর পর, পুনরায় দেহধারণ বা পুনরুত্থান হতে পারে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে বা স্থূল থেকে অধ্যাত্ম জগতে, যেখান থেকে পুনরাগমণ আর হয় না। "যিনি জগৎ-প্রপঞ্চকে ভেদ করে অভয় সত্ত্বশুদ্ধিতে অবস্থান করেন তাঁকে আমার ঈশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভরূপে সমাদৃত করি, সে কখনই প্রত্যাবর্তন করবে না।"

জীবাত্মা যেখানেই থাকুক না কেন, সচেতনেই হউক, অচেতনে হউক আর অধিসত্ত্বাতেই হউক অবশ্য যদি সুকৃতি থাকে, সে নিশ্চিতই সুযোগ পায় তার

তরঙ্গায়িত প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখে বিবেক প্রয়োগে উন্নীত হওয়ার। তা' স্থূল জগতেও হতে পারে আবার সূক্ষ্ম জগতেও হতে পারে। কেউই আমাদের স্বাধীন চিন্তা এবং বুদ্ধি-বিচার ছিনিয়ে নিতে পারেন না যখন একবার তা' প্রদত্ত হয়েছে। জীবাত্মাগণ অনেকবার জন্মাবে যতক্ষণ না তাদের স্বাধীন চিন্তার সদ্-প্রয়োগ নিঃশেষ হয় এবং মায়া-প্রপঞ্চের খেলা শেষ করে পরমাত্মায় লীন হয়।

একদা একটি জীবাত্মা বলেছিল – "হে ঈশ্বর! তোমার জন্যই তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ, আমাদের চিত্ত সতত চঞ্চল যতক্ষণ না তোমাতে বিশ্রাম লাভ করে।" এই সঙ্গে আমি একটু সংযোজন করব, "যতক্ষণ না তোমাতে বিশ্রাম লাভে উপযুক্ত হয়।"

জীবাত্মা এ জীবনে, মৃত্যুর পরপারে, সূক্ষ্ম জগতে এবং যে কোন সময় যে কোন স্থানে বিকশিত হয়।

একমাত্র জীবিত অবস্থায় নিদ্রায় বা মৃত্যু জনিত দীর্ঘ নিদ্রায় জীবাত্মা ক্ষণকালের জন্য হয়ত বিশ্রাম করে, কিন্তু সদা সর্বদা পশ্চাতগতিতে কিংবা সম্মুখগতিতে আলোড়িত এবং সঞ্চারিত হতে থাকে। যদি তুমি শান্তিতে কিংবা ভয় বিহ্বলিতভাবে নিদ্রা যাও, জেগে উঠে সেইভাবে শান্ততা কিংবা উদ্বিগ্নতা অনুভব কর। সুতরাং মৃত্যু-নিদ্রায় আমরা আমাদের জীবনকে সঞ্চালন করতে থাকি এবং বুদ্ধি সতেজ হতে থাকে। সজীবতায় কিংবা মৃত্যুতে বুদ্ধির যে কোন সঞ্চালনকে বলা হয় "স্পন্দনশীলতার পরিবর্তন।"

গ্যাব্রিলের নিনাদ কি?।

ত্রিতাপ দগ্ধ জীবাত্মাদের ভৌতিক ক্লিষ্টতা থেকে ব্যাধিহীন, দুর্ঘটনা মুক্ত, ব্যথাহীন, সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ-মুক্তির জন্য যে মহান্ উন্নতকামী স্পন্দনশীলতার পরিবর্তন যা' দিব্য-নিয়মের দ্বারা সঞ্চারিত হয় তাকেই বলা হয় "গ্যাব্রিলের দুন্দুভির নিনাদে পুনরুত্থান"। স্থূল-দেহ থেকে সূক্ষ্ম-দেহ ফস্কিয়ে বা খোলস ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় সদ্য-মুক্ত তেজস্ক্রিয়-রশ্মি-ইলেক্ট্রনের গুঞ্জন ধ্বনির জন্ম দেয়। এই দিব্য

উন্নতকামী শব্দ, যে কোন জীবাত্মা, সৎ-সংস্কার বিশিষ্ট বা অসৎ-সংস্কার বিশিষ্ট, মৃত্যুর পর স্থূল থেকে সূক্ষ্ম-জগতে অবস্থান্তরে নিশ্চিত সূক্ষ্মভাবে শ্রবণ করবে।

অবশ্য যীশুর তিন দিনে পুনরুত্থানের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তিনি অতি-মানবীয়সত্ত্বায় এত উন্নত ছিলেন যে, যেমন খুশী তার জীবাত্মাকে স্থূল-দেহ কিংবা সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করাতে পারতেন আবার আত্মিক সত্ত্বায় বিলীন থাকতে পারতেন।

যীশু কেন পুনরুত্থানের জন্য তিন দিন লাগিয়েছিলেন ...

যীশুর আপাত দেহত্যাগের পর যখন মেরী যীশুকে দেখলেন তখন যীশু বললেন – "আমায় ছুঁয়ো না, আমি এখন পরম পিতার নিকট পৌঁছই নি।" এটাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে যীশু তিন দিন সময় নিয়েছিলেন তাঁর প্রজ্ঞা-স্পন্দন--রূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অবশিষ্ট মায়া-প্রসূত কর্ম-সংস্কার প্রজ্বলিত করতে। কারণ পার্থিব-জীবনে আংশিক মৃত্যু-ভয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন – "হে পরম পিতা। যদি তুমি চাও, এই খোলসটা সরিয়ে নাও। যদিও আমার ইচ্ছে নয়, তোমারই, তুমি যা' হয় কর।" তৎপর পবিত্র ক্রুস্ এর সামনে চীৎকার করে বলেছিলেন-"হে পিতা, হে ঈশ্বর, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে?" ক্ষণকালের জন্য ঐহিক মৃত্যুর মায়া এমন বিকটভাবে প্রকটিত হয়েছিল যে, যীশু বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁরই দিব্য-পরম পিতা, কখনই তাঁকে পরিহার করতে পারেন না। এই অতিমানবীয় দুর্বলতা, যত ক্ষুদ্রই হউক, সূক্ষ্ম জগতে নিঃশেষ করতেই হয়, যীশুর ন্যায় মহামানবদেরও।

পূর্ণ পুনরুত্থানের পর সে যা 'ইচ্ছে তাই' করতে সক্ষম।

মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম-জগতে যখন যীশু পূর্ব-কর্মের বীজ নিঃশেষে ভষ্মীভূত করলেন তখন তিনি সরাসরি প্রভুর সাযুজ্যলাভ করলেন, আত্মিক-জগতে লীন হ'লেন সেখান থেকে অবশ্য প্রত্যাবর্তন আর করতে হয় না - না জগতে - না অন্য কোথাও। অতঃপর, যীশু নিজেকে পুনরুত্থিত করলেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম-জগতে, তৎপর আত্মিক-জগতে, তিন দিনে। পুনরুত্থানের পর তিনি যে জগতে চল্লিশ দিনের

জন্য পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের সম্মুখে, এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ সূক্ষ্ম-জগতে কিংবা স্থূল-জগতে, যে কোন সময় -বর্তমানে যে কোন সময় কিংবা সহস্র বর্ষ পরেও দেহ-ধারণ করতে পারেন।
যীশুর ন্যায় সালোক্য বা সাযুজ্য মুক্ত পুরুষ যে কোন জগতে দেহ ধারণে বা অবতরণে বাধ্য নয়, কিন্তু তাঁদের অবতরণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

কোন্ শ্রেণীর জীবাত্মা স্থূল-জগতে, সূক্ষ্ম-জগতে, আত্মিক-জগতে দেহ ধারণ করে?

যখন সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করে, তখন বৈদ্যুতিক ছবিসুলভ জ্যোতির্ময় দেহ ধৃত হয়। স্থূল-জগতে জীবাত্মা সূক্ষ্ম-দেহকে ঘনীভূত করে ভৌতিক দেহ প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মীয় সত্তায়, জীবাত্মা মায়িক দেহকে অসীম-চৈতন্যে বিগলিত করে রাখে, স্বাপ্নিক ক্ষুদ্রকায়ের চেতনায় নয়। জীবাত্মা কখনই ব্যক্তিত্বকে হারায় না, তাঁরা শুধুমাত্র ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে। যেমন কোন ব্যক্তি প্রথমে ক্ষুদ্র কুঠরীর মালিকানা থেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও নিজেকে ভুলে যায় না, তদ্রূপ জীবাত্মা তাঁদের পরিচিতি বজায় রাখেন যখন ক্ষুদ্রকায়ের চেতনা থেকে অসীম-চৈতন্যে প্রবেশ করেন পরিব্যাপ্ত দেহরূপে। কর্মাশয়গ্রস্ত জীবাত্মাদের স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে এবং পুনরায় স্থূল-দেহে পুনর্জন্মরূপে চক্রায়মান হতে হয়, যত দিন না তারা এমন উৎকর্ষতা লাভ করে যাতে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম থেকে পরমাত্মীয় সত্ত্বায় পুনরুত্থানের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

পুনরুত্থানের পদ্ধতি কি করে অনুশীলন করা যায়।

পুনরুত্থানের নিয়ম আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন কখনই পশ্চাৎপদ না হই, বৃদ্ধ বয়সেও, এমনকি মৃত্যুর-দোরগোড়াতেও যেন নিরুৎসাহ না হই। প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা উৎকর্ষতা লাভে প্রাণপণ সচেষ্ট থাকি, কারণ মৃত্যুর পরও জীবনের ধারাবাহিকতা তরঙ্গায়িত হতে থাকে, হয়, অপেক্ষাকৃত সুন্দর পুষ্পিত সূক্ষ্ম-জগতে কিংবা নব-উদ্যমে পল্লবিত স্থূল-জগতের পরিবেশে। আমরা সকলেই

নিশ্চিত জেগে উঠব গ্যাব্রিলের প্রজ্ঞাধ্বনি শ্রবণ করে আত্মিক রাজ্যে অনুপ্রবেশের জন্য, যেখানে নেই বিস্মরণ, নেই প্রত্যাবর্তন।

এমনকি যীশু যেমন পার্থিব-বাসনাকে জয় করে, জীবন-মৃত্যুর উপর পরিপূর্ণ আয়ত্ব লাভ করেছিলেন, তদ্রূপ আমরাও সুনিশ্চিত গভীর ধ্যানের অনুশীলনের দ্বারা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেহে প্রবেশ বা নির্গমন করতে পারব। ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ জীবাত্মাকে মায়া-প্রপঞ্চ থেকে নিজ নিকেতন অমরত্বে প্রতিষ্ঠা করব।

যখন কোন মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় যে কোন সময় অবতরণ করতে পারেন, তখন তিনি পরমাণুসমূহকে জমিয়ে দেহে রূপান্তর করে পৃথিবীতে এসে তাঁর প্রিয়-অমর-রাজ্যচ্যুত ভ্রাতাদের অমর ধামে নিয়ে যান।

লা-জবাব লন্ডন **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

গ্রেট ব্রিটেন অর্থাৎ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আর ওয়েলসের সাথে যখন নর্দান আয়ারল্যান্ড যোগ হয়ে ইউনাইটেড কিংডম বা ইউকে হয়ে যায়, আমরা গেছিলাম সেই যুক্তরাজ্যের তথা ইংল্যান্ডের রাজধানী ১৫৭২ বর্গকিলোমিটারের লন্ডন দেখতে। পরে বুঝেছি, ৪৭ খ্রিস্টাব্দে টেমস নদীর ধারে তৎকালীন রোমানরা যে লন্ডিনিয়াম স্থাপন করেছিলেন, ২০০০ বছরের নানান পালাবদলের মধ্যদিয়ে তা যখন লন্ডন নামে মিডলসেক্স, এসেক্স, সারে, কেন্ট আর হার্টফোর্ডশায়ার কাউন্টিতে ছড়িয়ে পড়েছে, আমরা তার প্রায় কিছুই দেখিনি। দেখেছি মূলত ২.৯ বর্গকিলোমিটারের সিটি লন্ডন এবং তার লাগোয়া ওয়েস্ট মিনিস্টার শহরের কিছু বাছাই করা সৌধ। তবে বলতেই হবে, কলকাতা থেকে দু'দফায় সাড়ে বারো ঘন্টা উড়ে ৭৯৬৭ কিলোমিটার দূরের স্বপ্নপূরণের রাজ্যে পৌঁছে যা দেখেছি তা কিন্তু নিতান্ত কম কিছু নয়।

লন্ডনের উদ্দেশ্যে আমাদের চব্বিশ জনের একটা দলকে উড়িয়েছিল 'স্মাইলস পার মাইলস' ২৩ মে'র ভোর রাতের ফ্লাইটে। নেতাজি সুভাষ বিমান বন্দর থেকে ঠিক ৩.৫০-এর QR-541 আকাশে ডানা মেলতেই যে চলার শুরু, কাতারের রাজধানী দোহাতে সামান্য দম নিয়ে QR-003-র নতুন ডানা তাকে এনে ফেললো লন্ডন টাইম দুপুর ১টা ১৫র হিথরো বিমান বন্দরে। ততক্ষণে মোটের ওপর ৮৯৬৫ কিলোমিটার ডানা ঝাপটেও আমরা কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত। লন্ডনে পৌঁছে গেছি যে। প্রথমেই বলে রাখি, অতিরিক্ত প্রায় হাজার কিলোমিটারের ঝক্কিটা কিন্তু থাকতো না যদি মুম্বাই-দিল্লির মতো কলকাতা থেকেও লন্ডনের ডাইরেক্ট ফ্লাইট থাকতো। হিথরো থেকে নিউ-ভারত বাসের পাকিস্তানি ড্রাইভার যে অট্রিয়াম হোটেলে নিয়ে এল তা বিমান বন্দর থেকে বেশি দূরে না হলেও শহর লন্ডন থেকে অনেকটাই দূরে- প্রায় ৩০ কিলোমিটার। স্বভাবতই পিকাডিলি সার্কাসের আশেপাশে রিজেন্ট স্ট্রীটের কোন হোটেলে থাকলে সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের মতো করে লন্ডনকে আরেকটু কাছে পাওয়ার যে সুযোগ আমাদের থাকতো, এখানে তা ছিল না। তাই ১৩ দিনের ইউরোপ ভ্রমণের প্রথম দু'দিনে যা দেখেছি তা এখানকার সপ্রতিভ চাইনিজ গাইড অ্যামি'র হাত ধরেই। বছর চল্লিশের ঝকঝকে অ্যামির লন্ডনের ইতিহাস ভূগোলের সাথে ইংলিশের ওপর দখলটাও বেশ ভাল। তাই ৫২ সিটের লাক্সারি গাড়ি থেকেই সে যখন কোনটা হিস্ট্রি মিউজিয়াম বা অন্য কোনও ইম্পর্টেন্ট ট্যুরিস্ট প্লেস দেখাচ্ছিল, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি।

সত্যিকারের লন্ডনের গন্ধ আমরা প্রথম পেলাম বাকিংহাম প্যালেসের সামনে এসে। বাস-কে পার্কিং প্লেসে রেখে এখান থেকেই শুরু হল পায়ে পায়ে পথ চলা। দিনটা ছিল শনিবার তাই প্রাসাদের সামনে গার্ড বদলের পালা আমাদের দেখা হল না বটে, কিন্তু তা তে কি? প্যালেসের বাইরে খোলা চত্বরে ভিক্টোরিয়া সমেত ফোয়ারা আর প্যালেস সহ সেলফির হিড়িক বুঝিয়ে দিচ্ছিল দেখাটা বেশ জমে গেছে।

ওয়েস্ট মিনিস্টার শহরের বাকিংহাম হাউস নামে পরিচিত এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ১৭০৩ সালে-বাকিংহাম এবং নরম্যানডির ডিউকের সৌজন্যে। ১৭৬১ সালে তৃতীয় জর্জ রাণী শার্লটের ব্যক্তিগত বাসভবন হিসেবে অধিগ্রহণ করলে এটি কুইন্সহাউস নামে পরিচিতি পায়। ১৮৩৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহন করার পর থেকে কুইন্সহাউস হয়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজার লন্ডন বাসভবন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বোমায় প্রাসাদের চ্যাপেল ধ্বংস হলেও পুনর্নির্মাণের পর ৭৭৫ কক্ষ ও লন্ডনের বৃহত্তম ব্যক্তিগত বাগান সমৃদ্ধ এই প্রাসাদ, এখন ব্রিটিশ জনগণের জাতীয় আনন্দ ও শোকের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের কথায় বলতে পারি, প্রাসাদ, উন্মুক্ত চত্বরে মানুষের ভিড়, পাশে সেন্ট জেমস পার্ক, লাগোয়া ইউনিয়ন জ্যাক শোভিত দ্য মল, যেখানে এখনও সেরিমোনিয়াল প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলে পুরো অঞ্চলটাতেই যেন বিলিতি হাওয়ার গন্ধ।

বাকিংহামকে পশ্চিমে রেখে যে দ্য মলের শুরু, অ্যামির প্রদর্শিত পথ তার শেষেই নিয়ে আসে পূর্বপ্রান্তের 'ট্রাফালগার স্কোয়ারে'। ওয়েস্টমিনিস্টার শহরের এই স্কোয়ার স্থাপিত হয়েছিল ১৯ শতকের প্রথমভাগে পূর্বতন চ্যারিং স্কোয়ারে। ১৮০৫ সালের ২১ অক্টোবর যখন ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফরাসি ও স্পেনের যৌথ বাহিনী ব্রিটিশ নৌ-বহরের কাছে পরাজিত হয়, যুদ্ধে জয়ী লর্ড নেলসন জীবন দিয়েও যখন নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন, তখন থেকেই যুদ্ধ জয়ের স্মরণে চ্যারিং স্কোয়ার হয়ে যায় ট্রাফালগার স্কোয়ার। জমজমাট এই স্কোয়ারে রয়েছে জেনারেল চার্লস জেমস নেপেয়ারের মূর্তি, স্যার এডুইনের তৈরি চার চারটি ব্রোঞ্জের সিংহ, সুন্দর ফোয়ারা এবং অবশ্যই ১৭ ফুট লর্ড নেলসনের মূর্তি সহ ১৮৫ ফুট উচ্চতার বিজয় স্তম্ভ। স্কোয়ারের অন্যতম আকর্ষণ তাকে কেন্দ্র করে 'দ্য ন্যাশনাল গ্যালারি' সমেত অন্তত দশটি মিউজিয়াম। কিন্তু মিউজিয়ামের শহর লন্ডনে আমরা ন্যাশনাল গ্যালারিকে শুধু বাইরে থেকে দেখেই ক্যামেরাবন্দি করি, ভিতর থাকে আমাদের চোখের বাইরে। এরপর আবার বাসে চলতে চলতে ডাউনিং স্ট্রীটের

কাছে হর্সগার্ড রোডে দেখতে পাই অনেক মানুষের ভিড়। অ্যামির কথায় দৃষ্টিটাকে মানুষের মাথার ওপর টপকে দিতেই দেখা যায় হোয়াইট হলে অবস্থিত হর্সগার্ডের প্রবেশ পথে দুই কালো ঘোড়ার ওপর দুই অশ্বারোহীর নিশ্চল পাহারা। সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা পরিবর্তন হয় তাই রক্ষে। না হলে ছ'ঘন্টা ধরে কৌতুহলী জনতার সামনে পুতুল হয়ে থাকতে হলে হয়েছিল আর কি।

এরপর আবার যেখানে বাস থেকে নামি সেটাই ওয়েস্ট মিনিস্টার শহরের কেন্দ্রবিন্দু। চার্চ, বিগবেন, প্যালেস সব কিছু নিয়ে যেন ইতিহাস এখানে কথা বলতে চায়। ঠিক কোথায় আছি বুঝতে চেষ্টা করি। টেমস নদীর গায়ে প্যালেস অফ ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথে পশ্চিমে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি'। আবার সেখান থেকে বিখ্যাত বিগবেনে'র উঁকিঝুঁকি দেখা গেলেও কাছে পৌঁছাতে হাঁটতে হয় মিনিট তিনেক উত্তর পথে। আমরা অবশ্য শুরু করেছিলাম শহরের কলেজিয়েট অফ সেন্ট পিটার্স চার্চ বা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি থেকে।

২২৫ ফুট উচ্চতার দুটি বুরুজ সহ ৩২০০০ বর্গফুট ফ্লোর এরিয়ার এই চার্চে রয়েছে দশ দশটি ঘণ্টা। সেই ঘণ্টাধ্বনির সাথে মনকে স্পর্শ করে এর ভাব গম্ভীর পরিবেশ। ৯৬০ সালে যে চার্চের প্রতিষ্ঠা, ১০৬৬ সাল থেকে সেখানে অভিষিক্ত হয়েছেন ৩৯ জন ব্রিটিশ রাজা, সমাধিস্থ ১৮ জন ইংলিশ অথবা স্কটিশ রাজা, আর ১১০০ সাল থেকে হিসেব করলে অন্তত ১৬টি রাজকীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সেই পবিত্র ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে। ইতিহাস তো কথা বলবেই। আগেই বলেছি অ্যাবির কাছেই রয়েছে লন্ডন শহরের অন্যতম আইকন বিগবেন। হাউস অব পার্লামেন্টের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এই বিগবেন আসলে ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদের ক্লকটাওয়ারে থাকা বিশাল ঘণ্টার নিকনেম, যদিও ঘড়ি সমেত টাওয়ারটাই এখন বিগবেন নামে পরিচিত হয়ে গেছে।

১৮৪৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যে টাওয়ার শুরু হয়, পরবর্তীকালে সেই

৩১৬ ফুট উচ্চতার টাওয়ার তার বিশাল ঘণ্টার কারণে বিগবেন হয়ে গেলেও ২০১২ সালে কুইন এলিজাবেথের (২) রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে তার নাম দেওয়া হয় এলিজাবেথ টাওয়ার। তবে ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া সে নামে আর আগ্রহী কে? আমরা যারা লন্ডন দেখতে এসেছি তাদের মনে ক্লকটাওয়ার অথবা এলিজাবেথ টাওয়ার কোন ঘণ্টাই বাজায় না, যেমনটা বাজায় বিগবেন।

বিগবেন থেকে প্যালেস অফ ওয়েস্ট মিনিস্টার যে সামান্য দূরে সে কথা আগেই বলেছি। হাউস অফ কমন্স আর হাউস অফ লর্ডস, এই দুই আইন সভার কারণে এটি লন্ডনের পার্লামেন্ট হাউসও বটে। ১০১৬ সালে তৈরি হওয়া যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম এই কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল ১৮৪৩ সালের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কারণে। ১৮৪০ থেকে ১৮৭৬ সালে নতুনভাবে সেজে ওঠা ১২,১০,৬৮০ বর্গফুটের এই প্রাসাদ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে পরিণত হয়েছে ১৯৮৭ সালে।

লন্ডন ওয়েস্ট এন্ডের আরেক পর্যটক প্রিয় ব্যস্ত অঞ্চল পিকাডিলি বা পিক্‌লি সার্কাসে পৌঁছে সে এক অদ্ভুত অবস্থা। পা নড়তে চায়না, অথচ অ্যামির নেতৃত্বে দলটাকে লন্ডন জনতার স্পিডে তাল মেলাতে প্রায় দৌড়ে চলতেই হয়। তার মধ্যেই জানতে পারি, ১৮১৯ সালে রিজেন্ট স্ট্রীটকে পিকাডিলির সাথে সংযুক্ত করতে যে সার্কাস বা বৃত্তের সৃষ্টি আজ তা রিজেন্ট স্ট্রীট ছাড়াও সাফটসবারি অ্যাভিনিউ, হে মার্কেট, কভেন্টি স্ট্রিট এবং অবশ্যই পিকাডিলির মত পাঁচ বড় রাস্তার সংযোগ স্থল। লন্ডন প্যাভিলিয়ন এবং ক্রাইটেরিয়ন থিয়েটার সহ বেশ কিছু উল্লেখ যোগ্য ভবন দ্বারা বেষ্টিত পিকাডিলির অন্যতম আকর্ষণ ওয়েস্ট এন্ডের প্রধান শপিংমল এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলি। রয়েছে সাফটবারি মেমোরিয়াল ফাউন্টেন এবং অ্যান্টেরোসের মূর্তি। ভিডিও প্রদর্শন এবং উত্তর কোণার ভবনে লাগানো নিয়ন সাইনবোর্ডের জন্য বিখ্যাত পিকাডিলির কাছাকাছি চায়না হোয়াইট সমেত প্রচুর নাইট ক্লাব, রেস্তোরা এবং বার থাকায় ভিড় এখানে উপচে পড়ে।

সিটি লন্ডনের সামান্য বাইরে টেমস নদীর উত্তর পাড়ে 'টাওয়ার অফ লন্ডন' আবার আমাদের মনকে নিয়ে এল প্রায় দেড় হাজার বছর পিছনে। আনুষ্ঠানিক ভাবে টাওয়ার সমেত আভ্যন্তরীন ওয়ার্ড হিজ ম্যাজেস্টির রয়্যাল প্যালেস হলেও এর কুখ্যাতি কিন্তু ভয়াবহ কারাগার হিসেবেও। ১০৬৫ সালের শেষের দিকে নরম্যান বিজয়ের স্মৃতিতে উইলিয়ম দ্য কনকার দ্বারা যা নির্মিত হয়েছিল ১০৭৮ সালে, দ্বাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে প্রথম রিচার্ড, তৃতীয় হেনরি এবং প্রথম এডোয়ার্ড তার সম্প্রসারন ঘটান। বর্তমানে পরিখা ঘেরা প্রাচীরে ভিতরে ৬ একর জমিতে ৮৯ ফুট উচ্চতার টাওয়ার লিবার্টি আর ১২ একর দুর্গের বেশ কয়েকটি ভবন নিয়ে যা তৈরি হয়েছে, সে যেন এক গভীর জটিল নকশা। রয়েছে অস্ত্রাগার, কোষাগার এবং ক্রাউন অফ জুয়েলস্ যেখানে রাজমুকুট, রাজদন্ড ছাড়াও রয়েছে নাদির শাহের লুটে নেওয়া মোঘলদের কোহিনুর। বন্দীশালা হিসেবে টাওয়ারের ব্যবহার ১১০০ সাল থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত হলেও বিশেষভাবে তা ব্যবহৃত হয় ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীতে। রাণী হওয়ার আগে প্রথম এলিজাবেথ, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালি, ক্যাথেরিন হাওয়ার্ড, লেডি জেন গ্রের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের বন্দী হতে হয়েছিল এই টাওয়ারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এই টাওয়ার আবার কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের পর জার্মান বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করে দুর্গটি খুলে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য। লন্ডন পর্যটন মানচিত্রে কতটা জনপ্রিয় এই টাওয়ার অফ লন্ডন, যখন শুনি শুধু ২০২৩ সালেই পর্যটক এসেছিল ২৭,৯০,২৮০।

টেমসের উত্তরে টাওয়ার আর দক্ষিণে লন্ডন আই যেন ইতিহাস আর আধুনিকতাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছে। পূর্বনাম যার ছিল মিলেনিয়াম হুইল, ৩৯৪ ফুটের ব্যাসের ক্যান্টিলিভার যুক্ত সেই বিশাল পর্যবেক্ষণ চক্র আজ তা লন্ডন আই নামে শহরের অন্যতম আইকন হয়ে উঠেছে। চক্রের ১ থেকে ৩৩ নম্বর ক্যাপসুল যখন প্রতিটিকে ২৫ জন যাত্রী নিয়ে ৪৮৩ ফুট উপরে ধীর গতিতে উঠে যায়, তখন সেখান থেকে একনজরে লন্ডন দেখার মজাই আলাদা। মজার কথা এই যে শেষ

ক্রমিক সংখ্যা ৩৩ হলেও সংখ্যায় কিন্তু তারা ৩২। কারণ সাহেবদের কুসংস্কার কোন ক্যাপসুলের নম্বর ১৩ রাখতে চায়নি।

দু'দিনের চরকি বাজিতে কখন অ্যামির হাত ধরেছি আর কখন যে নিজেরা ঘুরেছি সেটা সঠিক মনে নেই। হয়তো গোলমাল হয়ে গেছে ঘটনার পরম্পরাতেও। তবে মাদাম ত্যুসোর ওয়াক্স মিউজিয়াম দেখার আগে যে ফাইনালি তার সঙ্গ ছেড়ে ছিলাম তাতে ভুল নেই। ইতিমধ্যে গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল শার্লক হোমসের জন্য পরিচিত বেকার স্ট্রীটের ওপর কোন এক ম্যাকডোনাল্ডের সামনে। লাঞ্চটাইম, তাই নিয়ম রক্ষার তাগিদে না পাওয়া খিদেতেও একটা করে পিৎজা আর কোকো নিয়ে বসতে হয়। আসলে সকালের রাজকীয় কসপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খাবার পেটে ঢুকতো তাতে সন্ধ্যায় আরলি ডিনারের আগে পেটের ঘণ্টা বাজার কথা নয়। তবে সকলেই যখন দুপুরে কিছুটা সময় 'পা' কে বিশ্রাম দিয়ে হাত চালাতে চাইছে, আমরাই বা বাদ যাই কেন?

১৮৩৫ সালের ২২ মে ফরাসী মোম ভাস্কর মাদাম মেরি ত্যুসো যখন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অরিজিনাল সাইজের মোমের মূর্তি তৈরি করে লন্ডনের বেকার স্ট্রীটে তার ওয়াক্স মিউজিয়াম চালু করেন, তখন কে জানতো একদিন শুধু লন্ডনে নয়, এর শাখা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের নানান দেশের প্রধান প্রধান নগরে। ১৮৪৩ সালে মোমের মূর্তির সাথে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এর চেম্বার অফ হররস। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে স্থানের অকুলান হওয়ায় মিউজিয়াম চলে আসে বেকার স্ট্রীট মেট্রো স্টেশনের পাশে মেরিলিবোর্ন রোডের বর্তমান ঠিকানায়। নতুন সাজে সেজে ওঠা ৩ তলা বিশিষ্ট প্রদর্শনীশালার ৩০,০০০ বর্গফুট বিভক্ত হয়েছে ৮টি ভিন্ন অঞ্চলে। কে নেই আজকের এই মোম মুর্তির দেশে? ভারতীয়দের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই, শচীন তেন্ডুলকার যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্রায়ান লারা, নেলসন ম্যান্ডেলা, চার্লি চ্যাপলিন, মেরিলিন মনরো আর হিচককের মত ২৫০ এর বেশি ব্যক্তিত্বের মোমের মূর্তি।

আলো আঁধারি চলার পথে মাঝে মাঝেই মানুষের ভিড়। সকলেই সেলফি তুলতে চায় তাদের প্রিয় কোন নায়ক অথবা নায়িকার মূর্তির সাথে। কখনও অবাক হওয়া কখনও বা চমকে ওঠার শেষ হয় লন্ডন ট্যাক্সি অঞ্চলে। যখন সারি সারি চলমান ট্যাক্সির কোন একটায় আমি আর বুবুন চেপে বসতে পারি। এই ট্যাক্সি যাত্রাও কিছু কম চমকপ্রদ নয়। লন্ডনের ইতিহাসের সাথে ফ্যানটাসি এখানে সকলকে চুপ করিয়ে রাখে। অবশেষে শেষ হয়ে যায় ওয়াক্স মিউজিয়ামের পালা। শেষ কক্ষে অপেক্ষা করি দলের বাকি সকলের জন্য। সবাই একত্রিত হলে বাস আমাদের নিয়ে যাবে টেমস নদীর ধারে লন্ডন আইয়ের কাছে। সেখানেই এবারকার মতো লন্ডনের শেষ আইটেম 'টেমস রিভার ক্রুজ'। যদিও লন্ডন আই আর টেমস নদীর পাড় থেকে টাওয়ার অফ লন্ডনের নিকটতম সেতু টাওয়ার ব্রিজ আমাদের দেখা হয়ে গেছে, তবু টেমস নদীর ভেলায় ভেসে লন্ডনের পাঁচ সেতুর অন্যতম ১৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের এই ব্রিজকে শেষ বিদায় জানাবার অনুভূতিই যে আলাদা।

যাওয়ার আগে জেনে নিন:

১। লন্ডনে ডলার অথবা ইউরো চলবে না। চলবে একমাত্র ব্রিটিশ পাউন্ড, যার এই মুহূর্তে দাম ১ পাউন্ড স্টারলিং ১১৬.৪৪ ভারতীয় টাকা।

২। লন্ডনের হোটেলে ট্যাপ ওয়াটার ড্রিংঙ্কেবল তবে বাথরুম ব্যবহারে ভারতীয়দের অসুবিধা হয় কারণ কমোড শাওয়ার থাকে না।

৩। রাস্তায় খাবার দোকান বা মলে ফ্রি টয়লেট থাকলেও, অন্যত্র মাথাপিছু ২০-৫০ পেন্স অর্থাৎ ২৩ থেকে ৫৮ টাকা।

বাকিংহাম প্যালেস

লন্ডনের রিক্সা

টেমস নদী

বিগবেন

টাওয়ার ব্রিজ

মাদাম তুসোর জাদুঘর

চার্চ

লন্ডন আই ও লেখক

একটাই মন্ত্র

সুনন্দন ঘোষ

মসনদ দখলের নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রে রাতারাতি ছেঁড়া হল এ' দেশের মানচিত্র।
পাঞ্জাব, কলকাতা, নোয়াখালী -----
স্বধর্ম আঁকড়ে থাকা লক্ষ মানুষের ছিন্নদেহ,
শিশু আর ধর্ষিতাদের স্তূপীকৃত দগ্ধ শরীর!

দেড় হাজার বছর ধরে আরবীয় নেকড়েরা শিকারের রক্তে
জলের চাহিদা মেটায় .....
ওপারে দীপু দাস, কাশ্মীরে সরলা ভাট, ফ্রান্সে সামুয়েল প্যাটি ---
আর, আঁতেলরা মৃত্যুভয়ে কেউ সেক্যুলার, কেউ রুদ্ধবাক।

তরাইয়ের যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরী বন্দী করেছিল পৃথ্বীরাজ চৌহানকে,
কনৌজ-রাজ জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায়।
জয়চাঁদের উত্তরাধিকারীর হাতে এখন শাসনদণ্ড।
তাদের স্নেহে জিহাদীরা মসৃণভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে কোণায় কোণায় -
জনমিতির ভারসাম্য কৌশলে ভেঙে দিয়ে ----
কখনও খাগড়াগড়, কখনও সন্দেশখালি!

অনেকগুলো দশক কেটে গেলো।
এবার জিহাদ-প্রেমীদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার দিন।
একটাই নিশান – তিরঙ্গা।
একটাই মন্ত্র – "বন্দেমাতরম"।